জ্যোতিষ কি বিজ্ঞান

– বিপুল সাহা

১।

ভবিষ্যৎ জানার অদম্য কৌতূহল মানুষের মজ্জাগত। কখনো অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির জন্যে, কখনো বিশেষভাবে প্রার্থিত ফললাভের জন্যে। অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে মানুষের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত – ভাগ্যদেবী বা ঈশ্বর দ্বারা তা স্থির হয়ে আছে। তার স্বাখ'র আছে কোথাও না কোথাও। রাশিচক্রে বা হস্তরেখায়। ললাটের ভাঁজে বা কোন অনুমিত সংখ্যায়। শুধু তাই নয়, ভাগ্য পরিবর্তন করাও সম্ভব বলে মনে করা হয়। গ্রহশান্তি করে, শান্তিস্বস্ত্যয়ন-যজ্ঞ-তন্ত্রমন্ত্র করে, রত্ন-কবচ-মাদুলি-তাগা-ট্যাবলেট ধারণ করে বিদ্যা-বিবাহ-বশীকরণ-ব্যবসা-প্রেম-দাম্পত্য সমস্যা-চাকুরী-মামলামোকদ্দমা-সন্তানহীনতা-ব্যধিনিরাময়-ভৌতিক উপদ্রব সবই অনুকূলে সমাধান করা যায় বলে প্রচার করা হয়। এ ব্যাপারে অদৃষ্টবাদী তথা সহজে সুফল-প্রত্যাশী জনগণ খুবই উৎসাহী। শিখি'ত-অর্ধশিখি'ত-অশিখি'ত নির্বিশেষে। এই সকল শাস্ত্র-তন্ত্র-মন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত বলেও দাবী করা হয়। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এদের যুক্তি-বিজ্ঞানবিরোধী বলে গণ্য করে এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। হাল আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র পঠনপাঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে। তা নিয়ে যুক্তিবাদীরা আলোড়ন তুলছে।

এসব কাজে যারা করেন তারা জ্যোতিষী গণৎকার ইত্যাদি নামে পরিচিত। পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করে চলেছেন। জীবিকার স্বার্থে নানাভাবে প্রচার করার স্বাধীনতা তো হরণ করা চলে না। শ্রীমতী ভারতী বাল্যবয়সে নাকি একজন শাস্ত্রকারকে চেপে ধরেছিল – 'তা হ্যাঁ মশাই আমার জন্যে এত রত্ন-মাদুলী আপনার জন্যে কি করেছেন? নিজের ভাগ্যটাকে ফিরিয়ে আনুন আগে তারপর আমার ভাগ্য ফেরাতে উপদেশ দেবেন।' আরেক দুর্মুখ হরিদাস রায় মজা করে বলে – 'বাদী-বিবাদী দুজনেই জ্যোতিষীর কাছে অব্যর্থ সমাধান চায়। বলতো কি ফ্যাকরা! কাকে

জেতাবে অব্যর্থ রত্ন। দুজনকে জেতানো যায় না। তাহলে একজনের বেলায় অব্যর্থ ওষুধ ব্যর্থ।'

।। ২।।

আকাশের গ্রহতারকা পর্যবেখ'ণ থেকে জ্যোতিষ এবং জ্যোতির্বিদ্যার জন্ম। পর্যবেখ'ণ থেকে গ্রহনখ'ত্রাদির অবস্থান-গতিপথ ইত্যাদি নিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা কাজ করছে। জ্যোতির্বিদ্যা (অ্যাস্ট্রনমি) বিজ্ঞানশাস্ত্র কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র (অ্যাস্ট্রলজি) বিজ্ঞান নয়। জ্যোতিষ গ্রহনখ'ত্রের অবস্থান থেকে কাকতালীয়ভাবে ঘটা নানা ঘটনার সন্নিবেশ নজর করে অনুমান-নির্ভর এই শাস্ত্র নির্মাণ করেছে। যদি আকাশের তিরিশ ডিগ্রি কোনে এক নখ'ত্র বা রাশি এসে পড়ায় গাছ থেকে একটি তাল মাটিতে পড়ে, তখন শাস্ত্রকার বলেন অত ডিগ্রি কোণে নখ'ত্র বা রাশিটির অবস্থান হলেই গাছ থেকে তাল পড়বে। অনেকটা এইভাবে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার পূর্বাভাষের চেষ্টা হয়।

গ্রহ-নখ'ত্র-চন্দ্র-সূর্যর গতিপথ এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে মানুষের জীবনের নানা ক্রিয়াকলাপের ভবিষ্যদ্বাণী করাকে ফলিত জ্যোতিষ বলা হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষ্ক-পর্যবেখ'ণ গণ্য হয় গণিত জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিদ্যা নামে। জ্যোতিষ্কসমূহ তাদের গতি এবং আকাশে অবস্থান থেকে মানুষের সকল জীবনাচরণ ও ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করে এই বিশ্বাস থেকে শাস্ত্রটির উদ্ভব। এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যার ভিত্তি হল কোন অপার্থিব শক্তির প্রভাব। যোগাযোগ আছে অলৌকিকতা অতীন্দ্রিয়তা তন্ত্রমন্ত্র ভূত-প্রেত-দানোর উপর বিশ্বাসে। উপধারা হিসেবে জন্ম হয়েছে গণকবিদ্যার। তার মধ্যে পড়ে হস্তরেখাবিদ্যা সংখ্যাশাস্ত্র ইত্যাদি। সবার উদ্দেশ্য মানুষের ভবিষ্যৎ জানা, কর্মফল জানা, শুভাশুভ জানা, কর্তব্যকর্ম জানা। এবং অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন বা সমস্যার সমাধান।

৩।

জ্যোতিষের প্রাচীনতম বই বলে এখন পরিচিত মিশরের ক্লডিয়াস টলেমিয়াসের 'টেট্রাবিব্লিয়াস'। ভারতে লেখা হয়েছে 'হোরাশাস্ত্র'। ষষ্ঠ শতকের বরাহমিহির রচনা করেছেন 'বৃহৎসংহিতা' এবং 'বৃহৎজাতক'। পরাশর লিখেছেন 'বৃহৎ পরাশর হোরা'। তাঁর মতের সঙ্গে জৈমিনির মতের অমিল আছে। ভৃগু ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ নাকি সম্ভাব্য তেত্রিশ কোটি ছক ও তার সঠিক বিচার করে গিয়েছেন।

অতীতে বহু বিচিত্র উপায়ে ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা হয়েছে। তিন হাজার বছর আগেকার ব্যবলিনের ধর্মে ঈশ্বরের আদেশ (ওমেন) লাভ করা হত। সুমেরিয়দের আমল থেকেই হয়তো তা প্রচলিত ছিল। এই নির্দেশ লাভ করা হত নানা উপায়ে। যেমন বিবিধ অস্বাভাবিকত্ব বা বিকটত্ব থেকে, পশুপ্রাণীর গতিবিধি থেকে, প্রাচীরগাত্রের ফাটল থেকে বা জলপাত্রে তেল ঢেলে। ব্যবিলনবাসীরা দেবতার কাছে পশুবলি দিত এবং পশুর হৃৎপিন্ড থেকে ভবিষ্যদ্বক্তারা যজমানের ভাগ্য বলে দিত। কোথাও পশুর যকৃৎ ব্যবহৃত হত যজমানের ভাগ্যনির্ণয়ে। ক্যালডিয় এবং অ্যাসিরিয়দের মধ্যেও গণনাভিত্তিক জ্যোতিষ প্রচলিত ছিল।

গ্রীসের মন্দিরে মন্দিরে দৈববাণী (ওরাক্ল) হত। দেলফি মন্দিরের দৈববাণী অতি বিখ্যাত হয়েছিল। দোদোনা, অ্যামিফয়ারস, ট্রোফোনিয়াস মন্দিরেও দৈববাণী হত। সাধারণত পূজারী বা পূজারিণী দেবতার বাণী বহন করে আনতেন। এই সমস্ত মন্দিরের অবস্থান হত কোন ভূত্বকের ফাটলের কাছে বা উষ(প্রস্রবনের কাছে যেকারণে স্থানীয় মহিমার এক ভূমিকা ছিল। কখনো বলির পরে প্রার্থী দেবতার সন্নিকটে ঘুমিয়ে পড়ত এবং নিদ্রিত অবস্থায় সে তার প্রশ্নের উত্তরলাভ করত। (এ লায়ন হ্যাণ্ডবুক অব ওয়ার্লডস রিলিজিয়নস, পৃঃ ৬৩ এবং ১০১)

চিনদেশে পূর্বাভাষ পাওয়া যেত স্তন্যপায়ী পশুর কাঁধের হাড় কিংবা কাছিমের শক্ত খোলসের উপরকার দাগ থেকে। ঐ দাগগুলি হত হাড় বা খোলসের উপর জ্বলন্ত আগুনের খণ্ড চেপে ধরে। উত্তপ্ত হয়ে নানারকম ফাটলরেখা দেখা যেত। ফাটলের অবস্থান রেখা বিচার করে দৈববাণীর নির্দেশ দেওয়া হত। (পৃথিবীর ইতিহাস, চট্টোপাধ্যায়-মৈত্র, পৃঃ ৩৩৪)

এখন আমরা এই সকল প্রথায় আর ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করি না। বুজরুকি বলে বর্জন করেছি। আসলে আমাদের জানতে হবে — ভবিষ্যতের কোন পূর্বাভাষ আদৌ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্ভব কি না! ভাগ্যদেবী বা বিধাতা বলে কেউ আছেন কিনা। তিনি ভাগ্যলিপি বা বিধিলিপি বলে যা বলা হয় তেমন করে পূর্বনির্ধারিত সত্যি কিছু রেখে যান কি না। ভাগ্য বা বিধিলিপি হাতে-কপালে-গ্রহ-নখ'ত্রে কোন স্বাখ'র রেখে যায় কি না? পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য বদলানো যায় কিনা? যদি তা না জানা যায় বা না বদলানো যায় তবে একে বিজ্ঞান না বলে বুজ(কি বলা উচিৎ হবে।

বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়? বিজ্ঞান মূলত জ্ঞান আহরণের এক পদ্ধতি। নিরীখ', তথ্যসংগ্রহ, তত্ত্বনির্মাণ, পূর্বাভাষ, পরীখ'া ও তত্ত্বসংশোধন এই ধারায় কোন বিষয় নিয়ে চর্চিত হলে তবে তাকে বিজ্ঞান বলা সঙ্গত। বিজ্ঞান নিরবিচ্ছিন্নভাবে কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে বলে এভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানচর্চায় ঈশ্বর বা স্রষ্টা বলে কাউকে পাওয়া যায় নি। পাওয়া যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে — তিনি নেই এমনকথাও তো নিশ্চিত বলা যায় না। এর উত্তরে বলা চলে যে আসলে তিনি বাস্তবে অস্তিত্ববান হলে বিজ্ঞানে প্রতিফলিত হতেন। যেহেতু তেমন ঘটনা ঘটছে না তাই তিনি নেই বলাই সঙ্গত। আমরা বিজ্ঞানভাবনার বাইরে বসে তবুও বিশ্বাস করি জগতস্রষ্টা বলে একজন আছেন। যেহেতু বিজ্ঞানে ঈশ্বর বা স্রষ্টা নেই তাই ভাগ্যদেবী বা বিধাতা বলে কেউ থাকেন না। তাঁদের দ্বারা রচিত পূর্বনির্ধারিত বলে কিছু হয় না। তাদের লিপি নেই স্বাখ'র নেই গ্রহনখ'ত্রের অবস্থানে বা ললাটের ভাঁজে।

আচ্ছা, মানুষের ভবিষ্যৎ বা জগতের সবকিছু কি পূর্বনির্ধারিত হতে পারে? এর উত্তর অজানা। আধুনিক বিজ্ঞানে যতদূর পর্যন্ত আমাদের নজর বিস্তৃত তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জগতের সবকিছু কার্যকারণ সূত্রে বাঁধা। সেজন্যে যা হয়েছে এবং যেভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা যায়। হয়তো জগতের আরো অনেক ব্যাখ্যা জানা সম্ভব। তবে সবটা জানা সম্ভব কিনা তা প্রশ্নময়। আমাদের জানার এক প্রক্রিয়া আছে। সময়ের সঙ্গে জ্ঞান ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। সব জানতে যতটা সময় দরকার ততটা সময় প্রজাতি মানুষ পাবে কিনা সন্দেহ আছে। জগতের সামগ্রিক বিষয়টি এতই বিশাল এবং জটিল যে মানুষের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার জন্যে সব জানা প্রায় অসম্ভব বলা যায়। বিশ্ব তত্ত্বগতভাবে জ্ঞানগম্য তবে বাস্তবে নয়।

বিজ্ঞানে সব জানা না হলেও যতটা জানা হয়েছে তাতে কি আমরা পূর্বাভাষ দিতে পারি? কিছুদূর পর্যন্ত পারি। কোন ঘটনা বারবার ঘটলে তা থেকে৷ অর্থাৎ কার্যকারণ সম্পর্ক না জানা থাকা সত্ত্বেও পৌনঃপুনিকতা থেকে আগাম বলা যায়। সঠিক তত্ত্ব থেকে আগাম পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব হয়। আরেকপ্রকার পূর্বাভাষ হয় সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে স্ট্যাটিস্টিকাল ধরনের। এখানে অনেকগুলো সম্ভাব্য ঘটনার মধ্যে একটির সম্ভাবনা যাচাই করা হয়। তাতে সামগ্রিকভাবে কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাময় পূর্বাভাষ মেলে। কোন বিশেষ অবস্থান থেকে সে সম্ভাবনা সফল হতেও

পারে আবার নাও হতে পারে। সিকিম সরকারের সুপার লোটো খেলায় আপনার সংখ্যা মিলতে পারে নাও মিলতে পারে। কিন্তু একবার একজনের একটি সংখ্যা অবশ্যই মিলে যাবে। একে আমরা সফল একজনের দৃষ্টিতে ভাগ্য বলতে অভ্যস্ত। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে সামগ্রিক অবস্থান থেকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মানুষের পরমায়ু ষাট বছর বললে সকল মানুষ ষাট বছর পর্যন্ত বাঁচে না। কেউ দশে কেউ বিশে কেউ সত্তরে কেউ আশিতে মারা যেতে পারে। এ সব ভাগ্য নয়। এ হল বহুকে নিয়ে একের চলার বিড়ম্বনা।

ঈশ্বরবিহীন জগতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী পূর্বনির্ধারিত নয় বলেই মনে করা সঙ্গত। ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে অতীত এবং বর্তমানের ফলশ্রুতি। অতীত-বর্তমানের টানাপোড়েনে তা নির্ণীত হয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত না হলেও কার্যকারণ সূত্রে অবশ্যই গ্রথিত। সমগ্র বিষয় জানা থাকলে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। সমগ্র আমাদের জানা নেই বলে তা করা যায় না।

অপবিজ্ঞান বলতে বুঝি যা বিজ্ঞান নয় অথচ বিজ্ঞানসুলভ বলে দাবী করে। হয়তো কিছু কিছু জায়গায় খানিকটা করে বিজ্ঞানসুলভ হিসেব বা বিচার-বি(-ষণ করা হয় কিন্তু মূলত তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না। এই শ্রেণির অন্তর্ভূকত আমাদের আলোচ্য জ্যোতিষবিদ্যা যার মধ্যে পড়ে কুষ্টি-ঠিকুজি-রাশিচক্রবিচার। হস্তরেখা বিদ্যাও। কারণ এই সকল শাস্ত্রে তত্ত্বনির্মাণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। এখনও হয় না বা হতে পারে না।

৫ ।

জ্যোতিষশাস্ত্রের শুরু জাতকের জন্মসময় থেকে। যথার্থ স্থানীয় সময় নির্ণয় করা হয় — স্টান্ডার্ড সময় থেকে স্থানীয় দ্রাঘিমাংশ হিসেব করে। ঠিক ঐ সময়ে আকাশে রবি ও সোম (চন্দ্র) সেই সঙ্গে শুত্র(-বুধ-মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি এই পাঁচটি গ্রহের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে প্রথম গোলমাল হল এই যে রবি গ্রহ নয়, নখ'ত্র। আবার সোম উপগ্রহ। অতীতে গ্রহ-উপগ্রহ-নখ'ত্র এদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়নি। সবই জ্যোতির খেলা বলে মনে করা হত। এখন আমরা বিজ্ঞান থেকে জানি নখ'ত্র এক জ্বলন্ত বস্তুপিণ্ড, গ্রহ-উপগ্রহ জমাটবাঁধা বস্তুপিণ্ড। অথচ এদের গ্রহ বলা হচ্ছে কেননা অতীতে এদের গ্রহ হিসেবে দেখা হত।

আরো নির্ধারণ করতে হয় রাহু-কেতু নামের দুটি গ্রহের অবস্থান। এরা গ্রহ নয়, উপগ্রহ নয়, নখ'ত্র নয়। কোনকিছুই নয়। স্রেফ গল্পকথায় এদের অস্তিত্ব। প্রভাবশালী দৈত্য হিসেবে গ্রহণের কারণ হিসেবে। এখন বিদ্যালয়ের পাঠেও বোঝা যায় গ্রহণের ব্যাপারে অস্তিত্বহীন রাহুকেতুর ভুমিকা নেই। তবু জ্যোতিষশাস্ত্রে তাদের স্থান ছিল এবং আছে প্রবলভাবে। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে বাতিল করা যাচ্ছে না। কিছু কিছু জ্যোতিষী আধুনিক গেঁজানো ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন। এখন প্রশ্ন হল যার অস্তিত্ব নেই তার প্রভাব থাকে কি করে? বিচার করা তো পরের কথা। শাস্ত্রটাই ভুলের উপর দাঁড়িয়ে নয়? তাছাড়া বৃহস্পতি ও শুক্র কেন শুভ হবে? রবি-মঙ্গল-শনি কেন পাপগ্রহ হবে? গ্রহদের মধ্যে শত্রুমিত্র সম্পর্ক কি করে হয়? এসবের পিছনে পুরাণকথাই ভিত্তি?

আকাশের যে বৃত্তপথ ধরে রবি ও সোম আপাত চোখে পরিভ্রমণরত তার মান তিনশত ষাট ডিগ্রি। একে বারটি খণ্ডে বিভকত করা হয়েছে। এক এক খণ্ড তিরিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করছে। রাশিচক্রের এই বারোটি ঘর বারো মাসের কথা ভেবে। বহুকাল ধরে কয়েকটি নখ'ত্রমণ্ডল এই বৃত্তপথটি জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এদের প্রাণীসুলভ আকৃতি কল্পনা করে রাশি নাম দেওয়া হয়েছে। বারটি রাশির নাম — মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এক একটি গ্রহ এক একটি রাশিচক্রের খেত্র বলে মনে করা হয়। কি করে তা হল? কোন রাশিতে এক গ্রহ তুঙ্গী কিন্তু বিপরীত বা সপ্তম রাশিতে নীচস্থ এমন ব্যাখ্যার যুকিত কী? এ ছাড়া আরো কোটি কোটি নখ'ত্র মহাকাশে রয়েছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে শুধু আমাদের গ্যালাক্সিতেই আছে কয়েক কোটি নখ'ত্র। আমাদের মতো আরো কয়েক কোটি গ্যালাক্সি আছে। সুতরাং দৃশ্য-অদৃশ্য নখ'ত্রের মোট সংখ্যা কত তা কল্পনাতীত। তাদের একই রকমভাবে জুড়ে জুড়ে পশু-প্রাণীর আদলে কোন-না-কোন নাম দিয়ে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভাবা যেত। কেন যে মাত্র ঐ বারটি নখ'ত্ররাশি মানুষের নিয়ন্ত্রক হিসেবে গণ্য হবে তার যুকিতগ্রাহ্য ব্যাখ্যা না দিলে জোতিষকে বিজ্ঞান বলে মনে করার কারণ নেই।

রাশিচক্রের অন্তর্গত সাতাশটি নখ'ত্রের সাহায্যে চাঁদের গতি পথ বোঝার চেষ্টা হয়। নখ'ত্রগুলি হল — অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশে-ষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যৈষ্ঠা, মূলা, পূর্বষাড়া, উত্তরষাড়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। আগেই বলা হয়েছে আমাদের গ্যালাক্সিতে এবং মহাবিশ্বের অন্যান্য

গ্যালাক্সিতে কোটি কোটি নখ'ত্র আছে। তার মধ্যে কেন এই সাতাশটি নখ'ত্র মনুষ্যজীবনে প্রভাবকারী হবে অন্যরা কেন নয়? এর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই।

জন্মের সময় আমরা না হয় কিছু বাছাই করা গ্রহ-নখ'ত্র-রাশির অবস্থান ঠিক করলুম। একমাত্র তারাই যে জাতকের জীবনে প্রভাব বিস্তার করবে তা কি করে নির্ধারিত হল? কোন গ্রহ এবং কোন নখ'ত্র কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে এ ব্যাপারটা কি করে ঠিক করা হল?

বলবেন — শাস্ত্রমতে।

শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তা তো কোন মানুষের রচনা। তা অভ্রান্ত হবে পরীখি'ত সত্য হলে। প্রচারে বা বিশ্বাসে নয়। সে পরীখ'া হয়নি। যা হয়েছে তা এই রকম। অনেক দিন ধরে অনেক পর্যবেখ'ণ করে একটি গ্রহ-নখ'ত্র সমাবেশ থেকে এক প্রকার ফলাফল কোন একজন সিদ্ধান্ত করেছেন। তা শাস্ত্র হিসেবে শিষ্যাদি মারফৎ প্রচারিত হয়েছে। একই পর্যবেখ'ণ থেকে সম্ভূত সিদ্ধান্তগুলো সঠিক কিনা তা কেউ যাচাই করছে না। বহুবার একাধিক গ্রহসম্মেলনের জন্যে মহা বিপর্যয় হবে বলে প্রবল প্রচার হয়েছিল। বাস্তবে সেকারণে কোন বিপর্যয় হয়নি। ষাটের দশকে একবার অষ্টগ্রহ সম্মেলন নিয়ে খুব যজ্ঞ-হরিনাম কীর্তন হয়েছিল। সবই অকারণে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন — কয়েকটি গ্রহ, রাশি এবং নখ'ত্রের সঙ্গে মানুষের জন্ম বা জীবনের সম্বন্ধ আছে একথা বললেই তো আর মেনে নেওয়া যায় না। কি করে সেই সম্বন্ধ রচিত হল এবং কি করে এরা মানুষের জীবনে ক্রিয়া করে তা জানতে হবে। মানুষের জীবনের ঘটনা অনেক মানুষের যোগাযোগে সম্পন্ন হয়। তাহলে অনেক মানুষ একজনের জন্যে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন। একজনের রাশিচক্র কি অনেকের রাশিচক্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? বিজ্ঞানচেতনা থেকে বলা যায় এরকম ভাবনা ভিত্তিহীন। মাধ্যাকর্ষণ বল আবিষ্কারের পরে জ্যোতিষীরা বলতে শু(করল — এই বলের মাধ্যমে গ্রহ-নখ'ত্ররা কাজ করে। তাহলে তো ওদের ভর এবং দূরত্ব হিসেব করে প্রভাবের তারতম্য গণনা করতে হবে। কিভাবে মাধ্যাকর্ষণ বস্তুকে আকর্ষণ করে তা আমরা জানি। কিভাবে ভবিষ্যতকে আকর্ষণ করে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়া আরো যে তিনটি বল আছে তাদেরও গণ্য করতে হবে। ওরা নিশ্চয়ই প্রভাবিত করবে মানুষ গাছপালা পশুপাখিদের। বাজারে যখন মুরগি জবাই করে তার ছালচামড়া ছাড়ানো হয় তখন কোন গ্রহ-নখ'ত্রের বিধানে হয়? পরে আবিষ্কৃত হয়েছে তিনটি গ্রহ ইউরেনাস-নেপচুন-প-ুটো এবং গ্রহাণুপুঞ্জ। গ্রহ হিসেবে এদের কোন প্রভাব থাকবে না? কোটি

কোটি নখ'ত্র আছে মহাকাশে তারা মূল্যহীন? আরো দেখুন — হয়তো ইতিমধ্যে ঐ নখ'ত্রদলের মধ্য থেকে কোন নখ'ত্র ইতিমধ্যে ভস্ম হয়ে গিয়েছে। আমরা সেখবর এখনো পাইনি। কেননা নখ'ত্ররা লখ'কোটি আলোকবর্ষ দূরে। অথচ তার প্রভাব গণ্য করা অব্যাহত থাকছে। আরো প্রশ্ন - একই সময়ে দুজন জন্মালে কি একই সময়ে শিখ'া-ব্যধি-বিবাহ-মৃত্যু হবে? একই সঙ্গে বিবাহ হলে বা মৃত্যু হলে তাদের রাশিচক্র কি একই হবে? ভূমিকম্পে বা ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তাদের রাশিমতো মৃত্যুযোগ একই প্রকার হবে?

যদি এদের বিজ্ঞান বলে গণ্য করতে হয় তবে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশে-ষণ করতে হবে। গ্রহ-নখ'ত্রের নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য যদি কোন নির্দিষ্ট ফললাভ হওয়ার হয় তবে তো সকলের বেলায় একই প্রকার ফললাভ হবে। তা হয় কিনা দেখতে হবে। অনেক মানুষের গোটা জীবনের তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশে-ষণ করে দেখতে হবে যে রাশিচক্রের সঙ্গে তা সংযুক্ত কিনা। যদি সংযুক্ত হয় তবে কিভাবে? এভাবে বিচার করা হয়েছে? হয়নি।

৬।

পৃথিবীতে বহু বন্দিত মানুষ জ্যোতিষে আস্থাবান। অনেক বিজ্ঞানীও। তার কারণ সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেখানে ধর্ম-ঈশ্বর-অদৃষ্ট জাতীয় ভাবনা যুক্তিবাদী ভাবনা থেকে প্রবল প্রভাব সম্পন্ন। মানুষ বিজ্ঞানধর্মী ভাবনায় পরিচালিত হয়েছে সীমিত সংখ্যায়। তার মধ্যে কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষও আছেন। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন — 'মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা। জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ হচ্ছে হিন্দুদের অত্যন্ত খ'তিকারক কুসংস্কারগুলির মধ্যে একটি। তুমি দেখবে জ্যোতিষ বা ঐ ধরনের সব রহস্যময় ব্যাপারে আস্থা সাধারণতঃ দুর্বল চিত্তের লখ'ণ। (সূত্র — উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ-১৯৪-৫ থেকে উদ্ধৃতি সাহুর 'ভূত-ভগবান শয়তান বনাম কাভুর', পৃঃ১৫৭)

সম্প্রতি নানা যুক্তিবাদী সভা এসব নিয়ে চর্চা করছে। নানা জনের বুজরুকি ধরা হচ্ছে। অলৌকিক বলে যা যা প্রচার করা হয় তার মধ্যে অনেক ভাঁওতা আছে তা ধরা হচ্ছে। যেমন সাত বছর আগে (১৯৯৫ সালে) ভারতে এবং প্রায় গোটা দুনিয়ায় দাবানলের মতো সংবাদ ছড়িয়েছিল যে পাথরের গণেশ চামচে করে দুধ খাচ্ছে।

নন্দী-শিবও। দেশেবিদেশে সকলে সহস্তে যাচাই করে দেখে নিশ্চিন্ত হচ্ছিলেন। পুরীর মন্দিরে পাণ্ডারা আনন্দে নৃত্য করতে করতে বলে উঠলেন — সত্যযুগ আসি গিলা। পদার্থবিদ্যার এক অধ্যাপক-মন্ত্রী পর্যন্ত বলে দিলেন — পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনা এখনো ঘটে তাহলে! ঐ সময়ে একজন চর্মকার (মুচি) তার তিন পেয়ে লৌহযন্ত্রের গায়ে চামচ ঠেকিয়ে দুধ গড়িয়ে দেখালেন সেটিও দুধ খাচ্ছে। আর বোঝালেন আমরা কত সহজে অলৌকিক বিশ্বাসে মজে যাই। মজতেই যেন চাই।

বোধ হয় ১৯৯৩ সালে বালক ব্রহ্মচারীর মারা গেলে তার ভকতকুল দেহটি সংরখ'ণ করছিলেন পুণ্যাত্মার পুনর্জীবন হবে বলে। মৃত্যু নয় তা ছিল নাকি নির্বিকল্প সমাধি। ভকতরা দলে দলে ছুটেছিল মহাত্মা দর্শনে। মরা মানুষ বাঁচানো ছাড়া সব রকম কর্মে পারদর্শী একজন স্থানীয় নেতার বিশেষ উদ্যোগে অবশেষে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন হয়। গুরু দেবের পুনর্জীবন লাভ হয়নি।

আরেকটি ঘটনা — ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯২। পার্কসার্কাস ময়দানে মূক-বধির-অন্ধ-খঞ্জদের সারিয়ে তুলতে এক 'ঈশ্বরের দূত' মরিস সে(লো আবির্ভূত হয়েছিলেন। রীতিমতো চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে। আয়োজন করেছিলেন শহরের অনেক নামীদামী মানুষজন। সেখানে হাজির ছিল তিরিশ হাজার দুঃস্থ বিশ্বাসী মানুষ। সঙ্গে যুকিতবাদী সমিতি-সংগঠনের কিছু সভ্য। ফল যা হবার তাই হল। মহাপুরুষটির বুজরুকি ধরা পড়ল। পুলিশের লাঠিচার্জ — সভা পণ্ড। আমারা নিশ্চিত থাকতে পারি যে ধারণা তবু অলৌকিকতায় মানুষের বিশ্বাস (ুণ্ণ হয় নি।

এসব তথ্য অনেকেই জানেন। তবু তারা অটল বিশ্বাস হারান না অলৌকিকতায়। শেরাওয়ালী স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন বলে এক যুবক (১৯৯৬) চিড়িয়াখানায় ঢুকে বাঘের গলায় মালা পড়াতে যায় এবং মারা পড়ে। সত্যিই 'অন্ধবিশ্বাস রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চেয়েও ভয়ঙ্কর।' শুধু কথার জাদুতে ঘোলা মনসাধামের তারাপদ মণ্ডল বোবা পাগল ঠাকুর হয়ে যান। তারও অনেক ভকত জুটে যায়। (আঃ বাঃ ১৪.১২.৯৫)

৭ ।

এসব থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে জ্যোতিষ বা এই সকল গণনাবিদ্যা শাস্ত্র বটে কিন্তু আদপেই কোন বিজ্ঞান নয়। কাকতালীয়ভাবে কিছু ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে পারে। সম্ভাব্যতার নিয়মে কিছু মিলে যেতে পারে। এতে জ্যোতিষ শাস্ত্র বা হস্তরেখাবিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণিত হয় না। আসলে ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছে বলে

প্রায়শঃই যে প্রচার করা হয় তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই করা হয় না। আমরা জানি কোন প্রশ্নের সম্ভাব্য দুটি উত্তর হলে কোন নির্দিষ্ট উত্তর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই। যেমন হেড-টেল করার বেলায় দেখা যায়। আমরা এরকম খে'ত্রে যে পঞ্চাশ ভাগ উত্তর মিলে গিয়েছে তার খবরটাই মাথায় রাখি। যে পঞ্চাশ ভাগ উত্তর মেলেনি তার খবর নিই না। সম্ভাব্যতার একটা নিয়ম আছে। সেই নীতি অনুসারে সবসময় কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাবে। আমাদের নজর করতে হবে — কতগুলি মিলছে আর কতগুলি মিলছে না।

প্রসঙ্গান্তরে বলে নেওয়া যাক মানুষের হাতে রেখার উদয় হয় কেন? গর্ভাবস্থায় শিশুর হাত মুষ্টিবদ্ধ থাকে। হাতের ঐ অবস্থান থেকে আন্দাজ করা সম্ভব যে হাতের মধ্যে কিছু ভাঁজ বা রেখা উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। বিবর্তনের নিয়মে হাতের আঙুল নাড়াচাড়ার জন্যে ও মুঠো করার জন্যে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। এই ভাঁজগুলোকে মানুষ নাম দিয়েছে আয়ুরেখা, মস্তিষ্করেখা, হৃদয় রেখা বলে। হাতের রেখার সঙ্গে আয়ু বা মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের কোন সংযোগ নেই। জীবনের ভবিষ্যতের কোন সংযোগ নেই। সম্পর্ক নেই তালুর উচ্চাবচ এক একটি ঢিপির সঙ্গে বৃহস্পতি, শনি, বুধ ইত্যাদি গ্রহের। ভবিষ্যদ্বাণী মেলা-না-মেলা কোন যুকিতসিদ্ধ ব্যাপার নয়। যদি মেলে তা কাকতালীয়। যদি না মেলে তাও।

মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে অতীব দুর্বল। ভবিষ্যতের ভাবনা তাকে আরো দুর্বল করে। যতদিন মনুষ্যসমাজে জীবনের অনিশ্চয়তা থাকবে, নানা সমস্যায় দীর্ণ হবে জগতসংসার, ততদিন জ্যোতিষ বা ঐ প্রকার শাস্ত্র টিকে থাকবে। সরল ও বিশ্বাসী মানুষকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে কিছু চতুর মানুষ থাকবে এবং সেসব কেন্দ্র করে জীবিকা থাকবে। যতদিন মানুষের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও যুকিতহীনতা থাকবে, অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে কিছু ব্যাপার মানুষের মনে দানা বেঁধে থাকবে ততদিন এই সকল শাস্ত্র-বিশ্বাস থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্রকেও বিজ্ঞানসম্মত হতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীখ'া-নিরীখ'া করতে হবে নতুন করে। তার ফলে শাস্ত্র টিকবে কি না তা অন্য প্রশ্ন।

বিজ্ঞানই অপবিজ্ঞানকে পরাস্ত করতে পারে। যুকিতবাদী ভাবনাই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুকত করতে পারে। আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সকল অপবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক।